



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 124 - 132

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভগীরথ মিশ্রের সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পে বাস্তববাদের বহুমুখী প্রবণতা

অঙ্কিতা রায়

গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : ankita@bccollegeasansol.ac.in

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Abstract

Discussion

৭০-এর দশক অর্থাৎ স্বাধীনতার বাংলার রাজনীতিতে সবথেকে আলোচিত অধ্যায়। এই সময় যাঁদের সাহিত্য জগতে আবির্ভাব তাঁদের গল্পে সময়ের দাবি মেনে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে বাস্তববাদের বহুমুখী প্রবণতা এসেছে। বহুমুখী প্রবণতা বলার কারণ বাস্তব কাহিনী বা প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে একজন লেখক তাঁর গল্পের কাহিনী নির্মাণ করেন, সেখানে শুধু বাস্তবতা নয়, বাস্তববাদ স্বভাবতই বিভিন্ন রূপে সেখানে আলাদা হয়ে গেছে। চল্লিশের দশকের পরবর্তী সাহিত্যে আমরা যে বাস্তবতা দেখতে পায় সত্তরের দশকের পরবর্তী ছোটগল্পগুলিতে তা সম্পূর্ণ আলাদা বাঁক নিয়েছে। এখানে যথাস্থিত বাদ বা Naturalism, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বা Socialist Realism এবং জাদু বাস্তববাদ বা Magic Realism কে গল্পে আলাদা আলাদা মাত্রাই ব্যবহার করা হয়েছে। এবং সেই সময় দাঁড়িয়ে ছোটগল্পের কাহিনীর ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। একই সময়ে আবির্ভূত হওয়া দু'জন লেখকের সৃষ্টি সব সময় একই হয় না। তাঁরা আলাদা হয়ে যান মূলত তাঁদের জীবন দৃষ্টির নিরিখে। বলা ভালো, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাস্তববাদী গোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পাশ্চাত্যের যে বাস্তববাদের উদ্ভব হয়, বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব অনেক পরে এসেছে। প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরোধিতা করে কল্লোল যুগের কবি লেখকরা বাস্তবতাকে সাহিত্যে স্থান দেন। বিগত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সাহিত্যে যে বিষয়ে ভাবনা জায়গা জুড়ে বসেছিল তার একমাত্র এবং সমগ্র বিষয় ছিল নরনারীর দেহজ প্রেম, কাম ও কল্পনা নিয়ে বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ করা। সত্তরের দশকের পূর্বে যেসব লেখকদের ছোট গল্পে সমাজ, মনস্তত্ত্ব, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ধরা পড়েছে এবং কথাসাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রের পূর্বসূরী হিসেবে আমরা যাঁদের গল্পে বাস্তববাদকে বেশ কিছুটা স্পষ্ট রূপে দেখেছি, তাঁদের কয়েকজনের গুটি কয় ছোটগল্প সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। ভগীরথ মিশ্রের সমসাময়িক যেসব কথাসাহিত্যিকের ছোটগল্পে বাস্তবতা এসেছে নানা মাত্রায় বা বলা ভালো প্রচলিত ধারণাকে ভেঙ্গে যাঁরা পাঠক মনে নব ধারণা জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করব। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪), অভিজিৎ সেন (১৯৪৫), সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০), নলিনী বেরা (১৯৫১), কিন্নর রায় (১৯৫৩), আফসার আমেদ (১৯৪৮), অমর মিত্র (১৯৫১), তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭), ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮),

দেবেশ রায় (১৯৩৬), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (১৯৫২) প্রমুখ। এই তালিকা আরো অনেক বড় হতে পারে, বা এই নিয়ে গবেষণার কাজও হতে পারে, কিন্তু শব্দের সীমা মাথায় রেখে খুব স্বল্প পরিসরে আমি এঁদের কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করব।

সাধন চট্টোপাধ্যায় : ভগীরথ মিশ্রের সমসাময়িক এক অন্যতম প্রথিতযশা সাহিত্যিক হলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। প্রথম থেকেই তিনি বামপন্থী চিন্তা ধারায় এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভাব আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। যে সময়ে তাঁর ছোটগল্পগুলি আমরা পায়, সেখানে গল্পের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রগতি চেতনার প্রতি তাঁর স্পষ্ট পক্ষপাত আমরা দেখতে পায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাঁর লেখার ধরনও বদলে যেতে থাকে। একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি নিজে বলেছিলেন যে -

“আমি মার্কসবাদী নই, আমি মানবতাবাদী। আমি মানুষকে গুরুত্ব দিই। মানুষের সমস্যা, ব্যক্তি সত্তার সংকট আমাকে ভাবায়। আমি সেই সংকট, সমস্যাকেই আমার গল্প উপন্যাসে ধরার চেষ্টা করেছি।”

তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে সমকালীন ঘটনা প্রবাহ রাজনীতি-সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ইত্যাদি সবই গল্পের চরিত্র নির্মাণ কিংবা আখ্যান গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর লেখা - চোরাই চালান (১৯৭১), ঢোলসমুদ্র (১৯৭২), চিংড়ি (১৯৭৯), মেহগনি (১৯৮২), পানশালায় (১৯৭৬) ইত্যাদি গল্পগুলি সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপরে লিখিত।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের এই গল্পগুলিতে আমরা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের ছাপ পায়। কারণ তখন সত্তরের দশকে উত্তাল সমাজ এবং সেই সমাজে জমিদার-জোতদার শ্রেণীর বা কায়মি স্বার্থ ভোগীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সময় আসে। এবং এই সাহস যোগায় কিছু শহরের মেধাবী তরুণ যুবক। যারা নাগরিক জীবন ছেড়ে গ্রামমুখী হয়েছিল এবং গ্রামের সাধারণ সরল মানুষগুলির সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে তাদের দুঃখ যন্ত্রণার শরীক হতে চেয়েছিল। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে এই বিষয়বস্তুগুলি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন ‘ঢোল সমুদ্র’ গল্পের বিষয়বস্তুতে আমরা ক্ষমতাতন্ত্র বিরোধী স্বর শুনতে পাই। প্রহ্লাদ নামক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক প্রতিবাদী মানসিকতার জন্ম দিয়েছেন। বারো মাসের দশ মাস বাড়ি থেকে দূরে থেকে সে কাজ করে সুখ পায় না। আসলে প্রেম-বিবাহ-যৌনতা জীবের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেইসবের অভাবে মানুষ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে এবং প্রহ্লাদের মত শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতার চাপে পড়ে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে একেবারে ছাড়তে পারে না, আবার পুরণও করতে পারে না। তাই তাদের মধ্যে প্রতিবাদের জন্ম হয় এবং তাদের এই প্রতিবাদ জানান দেয়, যে কোন মূল্যে তারা সামঞ্জস্যহীন ধূসর জীবন থেকে সাধারণ জীবনে ফিরতে চায়।

আবার ‘পানশালায়’ ছোটগল্পটি রচিত হয়েছে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যুব সম্প্রদায় দলে দলে কিভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল তাই এই গল্পের বিষয়বস্তু। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রও এক নিম্নবৃত্তীয় খেটে খাওয়া মানুষ, তুলসী নামক এক পৌঢ় রিকশাচালক। তার ছেলে যখন নকশাল আন্দোলনের যোগ দিয়ে প্রাণ হারায় তখন এক করুণ বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই গল্পের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। বলাবাহুল্য অভাবই বিপ্লব ডেকে আনে। আর এখানে সেই অভাব হল ক্ষুধা। সত্তরের দশক মুক্তির দশক, তাই দীর্ঘদিনের শোষণ বঞ্চনা মেনে নিতে না পেরে কিছু নিম্ন বৃত্তীয় অর্ধশিক্ষিত মানুষও নকশাল দলে যোগ দিয়েছিল। সকলেই যে নকশাল তত্ত্বকে বিশ্বাস করে সেই আন্দোলনে शामिल হয়েছিল তা নয় অনেকে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যেও এই পথে পা বাড়িয়েছিল। এবং তার ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছে মৃত্যু। এখানে তুলসী চরিত্রটি সেই সময়ের এক হতভাগ্য পিতার প্রতিনিধি। যার সন্তান অভাব বসতই নকশালকে পথ হিসেবে বেছে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। লেখক এখানে নিরাশঙ্ক ভঙ্গিতে আন্দোলনের মিথকে পরিত্যাগ করে এক নিদারুণ বাস্তবতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া তাঁর অন্যতম ছোটগল্প ‘চিংড়ি’ চরিত্র কেন্দ্রিক গল্প, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চিত্র এতে সুস্পষ্ট। নির্বোধ ক্ষমতা তন্ত্রের দাপটের বিরুদ্ধে আত্মশক্তিতে ভর করে একজন সাধারণ মানুষের জেগে ওঠার কাহিনী। চরিত্রের ভালো নাম শ্রীনিবাস হলেও গুণগ্রামে লোকে তাকে ঘেবো বলে ডাকে। ঘেবু শব্দটি এসেছে ঘা বাবু থেকে। চরিত্রের সাথে বাস্তবের পটভূমিকা মেলানোর জন্যই লেখক এই ধরনের নামের ব্যবহার করেছেন। যার মধ্যে দিয়ে চরিত্রটি কোথা থেকে উঠে

এসেছে এবং তাঁর খেটে খাওয়া জীবনটি বোঝাতে পারেন। ঘেবো আসলে কোন কাল্পনিক চরিত্র নয় বরং এই ধরনের মানুষ আজও সমাজে বেঁচে আছে যারা নিচু তলার হয়েও মাথা উঁচু করে বাঁচে এবং যাদের শিরদাঁড়া সোজা এবং নির্ভীক। কলকাতা থেকে আসা এক গুটিংয়ের দলে সে রান্নার কাজ পেয়েছে এবং তার সাথে সাথে দলের যাবতীয় ভালো-মন্দ বা অসময়ের খাবারের বন্দোবস্ত করার পরিত্রাতার ভূমিকায় সে কাজ করেছে। কিন্তু অনাথ এই ছোট লোকটির এত বার বাড়ন্ত গ্রামের লোক সহজে মেনে নিতে চাই না। সমাজে এই দৃশ্য খুবই পুরনো, খেটে খাওয়া মানুষ যতই নির্ভর সাথে সততার সাথে কাজ করুক না কেন তাকে একচুলও জায়গা ছেড়ে দিতে কেউ রাজি না। কিন্তু দেবো সেই প্রতিকূলতার মধ্যেও মাছ বেঁচে লড়াই করে টিকে থাকতে চাই। এখানেই ক্ষমতাতত্ত্বের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ সার্থক হয়ে ওঠে।

১৯৮২ সালে প্রকাশিত বিহারের পটভূমিকায় লেখা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম বিখ্যাত ছোটগল্প হল ‘মেহগনি’। যেখানে বর্ণ বিভাজিত প্রদেশে সামন্ততন্ত্র স্বমহিমায় তখনও আসীন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র সেখানে নিজেদের মত করে সন্ধি করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এখানেও সামান্য মেহগনি গাছ নিয়ে শাসক ও দুর্বল পক্ষের লড়াই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতারই এক কঠিন চিত্র তুলে ধরেছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এরকম আরো অনেক ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা ও অন্তর্বাস্তবতার বহুমাত্রিকতা নির্মিত হয়েছে। সব গল্পগুলি পড়লে হয়তো আমরা সেই পরিধিটা আরো ভালোভাবে তুলে ধরতে পারবো। তাঁর গল্পের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যটি হল সময় ও সমাজের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহে খরস্রোতা জীবনের স্বরূপ সন্ধান করা। সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন না বরং যতদিন না তার সংগৃহীত তথ্য একটা সক্রিয় অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি সেই বিষয়বস্তুর খোঁজ চালাতে থাকেন। তাঁর গল্পগুলিতে অনেকাংশেই মিথের নির্মাণ ও বিনির্মাণ ঘটেছে।

অভিজিৎ সেন : গল্পকার অভিজিৎ সেন হলেন কালান্তরের শিল্পী, সত্ত্বের কথা শিল্পীদের অন্যতম। মহাকালের গর্ভে বসে কাল তথা সময়ে তার বোবা মনটাই বয়ে যেতে যেতে সময়ের রক্তমাংস বীজকে তা দেহে জড়িয়ে নেয়। অভিজিৎ সেনের গল্পেও নিহিত এই বিশেষ স্থানের চেতনার উদ্ভাসে এবং ভূমিলগ্ন মানুষ গুলির কুসংস্কার নিয়ন্ত্রিত হয়ে বেঁচে থাকা, বা যাপিত জীবনের আড়ালে থেকে যাওয়া জীবনের প্রকৃত রূপটি তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্র তাই তুলে ধরেছেন। তার গল্পগুলি অধিকাংশই রচিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে। এবং লেখকের গল্পে কালান্তরের এমন সব ছবি ফুটে উঠেছে যে সেই গল্পগুলিতে সময়ান্তরের রূপকে কালান্তরকে মূর্ত হতে দেখা যায়। বরেন্দ্রভূমির গ্রামীণ জীবন ও আধুনিক জীবনযাত্রার আড়ালে সেখানে মানুষের অন্তর্গত চেতনায় যে লোকাচার কুসংস্কারের প্রভাব কতটা দৃঢ়ভাবে ফুটে উঠেছে তাই তার ছোটগল্পগুলিতে পরিস্ফুট। তার লেখার বেশিরভাগ অংশই তার গ্রামাঞ্চল বা মফস্বলের মানুষকে নিয়ে লেখা এবং সেইসব চরিত্ররা প্রায়ই জমি আশ্রয়ী মানুষ। অন্যদিকে অভিজিৎ সেন এর জীবনে যে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ ভাবে ধরা পড়েছে তা হল তার যৌবন কালে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা নকশাল আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ। অত্যাচারিত নিপীড়িত বা তখন নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে নিচ্ছে। বলাই বাহুল্য উত্তরবঙ্গের একটি ছোট গ্রাম নকশালবাড়িতে এই নকশাল আন্দোলনের উদ্ভব হয় যা পরবর্তীকালে ৭০ এর প্রথম পর্বে সবচেয়ে বড় আন্দোলনরূপে পর্য্য ঘোষিত হয়। তাই জন্মভূমি হিসেবে এবং সেই সময় হিসাবে অভিজিৎ সেন সরাসরি এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে এই নকশালবাড়ি আন্দোলন তার ছোটগল্পগুলিতে ছাপ ফেলবে। একই সাথে এই সময়ের মানুষজন এবং সমাজও ছোটগল্পের কাহিনীর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলি হল - ‘বর্গক্ষেত্র’, ‘মৌরুসীপাট্রা’, ‘দেবাংশী’, ‘দ্বাগ’, ‘সীমান্ত’, ‘অল্পপূর্ণা’, ‘আইনশুজলা’, ‘ব্যবচ্ছেদ’ ইত্যাদি।

তাঁর শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ক গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘দেবাংশী’। এই গল্পের প্রেক্ষাপটে আছে অপারেশন বর্গার জোরদার ও আতিয়ার সংঘর্ষের বহুদ্বীয় দিক একই সাথে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির জটিল বিন্যাস। আগেই বলেছি অভিজিৎ সেনের গল্পের চরিত্ররা প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে আতাই মানুষ তাই তারা ভূমিকে কেন্দ্র করেই রামাঞ্চলে শাসন প্রশাসন রাজনীতি বিশ্বাস সংস্কার ইত্যাদি নিয়েই বেঁচে থাকে। দেবাংশী গল্পে ভূমি কেন্দ্রিক সমস্যা ও লোকাচার সমাজের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক। এবং এই চরিত্রটি যে তিনি বাস্তব জীবন থেকে নিয়েছেন তাও এক

সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেছেন। বলাই বাহুল্য যে ভগিরথ মিশ্রের সমকালীন লেখক অভিজিৎ সেনের গল্পেও বাস্তবতা এসেছে পুরো মাত্রায়।

আবার ‘বর্গক্ষেত্র’ গল্পটিতে বর্গা সমস্যাকে কেন্দ্র করে এক জটিল শ্রেণী সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। একদিকে আধিয়ারদের অন্ধ আনুগত্য ও দাসভক্তি, অন্যদিকে জোতদারদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনা কিভাবে বর্গা সমস্যাকে আরও জটিলতরো করে তুলেছে তা-ই এই গল্প তুলে ধরা হয়েছে। যেহেতু সময়টা 1980 সাল তাই স্বাভাবিকভাবেই জমি-পুলিশ-রাজনীতির রসায়ন প্রত্যাশিত। গল্পে সত্তরের দশকের শেষ এবং আশির দশকের শুরুর দিকের সমাজ পরিবর্তনের যে ধারাটি প্রবাহমান অভিজিৎ সেনের গল্পে রাজনৈতিক সামাজিক বিশ্লেষণ এই সমাজ বাস্তবতা খুব স্বচ্ছ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

‘আইনশুজলা’ গল্পে ফুটে উঠেছে গ্রামের জমি সংক্রান্ত মধ্যস্থানীয় ব্যবস্থা। ব্যবস্থা বলা ভুল হবে কারণ ব্যবস্থার রূপান্তরের কাহিনী এবং শ্রেণী সম্পর্কে জটিল টানা পোড়েনের বিষয়টিকে এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। গল্পের কাহিনীতে বলা হয়েছে নাগর নদীর তীরে খুবই প্রাচীন ভূখণ্ডের উর্বর গ্রাম আখিরা। সাম্প্রতিককালে সেখানে সরকারি উদ্যোগে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার পতন হওয়াতে গভীর নলক ও নদীর জল উত্তোলনের প্রকল্প বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তায় নলকূপের অনেক প্রকল্পের সৌজন্যে এতকালের ভাগে চাষ হওয়া জমিগুলি হঠাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিবর্তিত হয়ে উঠেছে। গ্রামে ব্যাংকের সহায়তায় একটি এ্যাড্রেস সার্ভিস সেন্টারের ও ব্যবস্থা হয়েছে। এত উন্নত শেষ ব্যবস্থা ও এর আওতায় আসা উর্বর জমিগুলোতে চাষাবাদ শুরু হলেও এক রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে সবকিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। তারপরেই শুরু হয় আখিরাই বর্গা সংক্রান্ত গোলযোগ এবং এখানেও বর্গা ঘিরেই সমাজতান্ত্রিক জটিলতা শুরু হয়েছে।

সুতরাং বলা যেতেই পারে যে অভিজিৎ সেনের গল্পগুলিতে একই ধারে শ্রেণী চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা পরিলক্ষিত। তবে ভগিরথ মিশ্রের গল্পগুলির মত বাস্তবতার নানা মাত্রা এখানে সেভাবে দেখা দেয় নি।

কিন্নর রায় : ৭০ এর দশকের আরেক উল্লেখযোগ্য কথা সাহিত্যিক হলেন কিন্নর রায়। তিনি এই সময়ে সকলের কনিষ্ঠতম। তার ১৬ টি গল্প সংকলনের শতাধিক ছোটগল্পের তিনি বেশিরভাগ গল্পে মানুষের জীবন ও তার ওপর সমাজের প্রতিফলন নিয়ে এক গভীর পর্যবেক্ষণী বিশ্লেষণী দিকের সুনিপুণ ছবি তুলে ধরেছেন। অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পে যেমন আমরা নকশালবাড়ি আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুবাদে সেই আন্দোলনের ছাপ ছোটগল্পগুলিতে পেয়েছি তেমনি কিন্নর রায়ের গল্প গুলিও অনেকটা নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে লেখা। এছাড়া নিজের জীবন অভিজ্ঞতার সাথে কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধনে তিনি ছোটগল্পগুলিকে অসাধারণ ভঙ্গিমায় রচনা করেছেন। সেই সময় দাঁড়িয়ে তাঁর লেখা বিখ্যাত গল্পগুলি হল- চিলেকোঠা, স্থিতাবস্থা, ডিসিডেন্ট, রথযাত্রা, ভোজ, পরচারক, উপমহাদেশ, ধর্ম সংকট ইত্যাদি।

আশির দশকের শেষ ও ৯০ এর দশকের শুরুতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে যে গোঁড়ামি বা ধর্মাত্মতা বা মন্দির মসজিদ ধ্বংসের লড়াই শুরু হয়েছিল, তারই প্রতিফলন ঘটেছে তার উপমহাদেশ, ধর্মসংকট এই গল্পগুলিতে। ধর্মের নামে মানুষের এই বর্বরতার প্রকৃতি তাকে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছে। মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতি অন্তর্দ্বন্দ্বকে একটি ছকের মধ্যে দিয়ে ছোটগল্পে পরিবেশন করেছেন।

তার বিখ্যাত গল্প চিলেকোঠায় এক অন্য বাস্তবতার রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে সত্তরের দশকের এক ব্যর্থ সৈনিক মিলন ১৪ বছর পর জেল থেকে ফিরেছে। কিন্তু জেলে যাওয়ার আগে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শের পথে চলতে গিয়ে তাঁর গীতির সাথে প্রেম ও বিয়ে এবং তাদের মেয়ে সৃষ্টির জন্ম হয়। জেল থেকে ফেরার পরে সে অনুভব করে সময়ের পার্থক্যকে। জেলে যাওয়ার পরের অবস্থা শুধু অর্থের দিক দিয়ে নয় বরং মানসিকতা এবং আদর্শের দিক দিয়েও পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় সে ফিরে গেছে তার মফস্বলের বাড়িতে যেখানে মা ও দাদার পরিবারের সাথে ভাই বোন সকলেই থাকে। সেখানেই তার স্থান হয়েছে এক চিলেকোঠার ঘরে। একদিকে এই চিলেকোঠার ঘরে তার ছোটবেলার বিভিন্ন স্মৃতি আবার অন্যদিকে নকশাল হিসেবে পরিচিত মিলন আজ সমাজ ও পরিবারের কাছে জীবন্ত আত্মকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। আসলে নকশাল পরবর্তী জীবনের মানুষের করুণ প্রতিচ্ছবি লেখক এই গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন

তার স্থিতিবস্থা ও ডিসিডেন্ট গল্পগুলিতেও কিছুটা এই সমাজ বাস্তবতা ও অন্তর্দৃষ্টিবতার চিত্র পরিলক্ষিত। সেখানেও ওই একই জীবন বোধের চিত্র ধরা পড়েছে। মূলত সত্তরের দশকের কথাসাহিত্যিক হওয়ার দৌলতে শুধু ভগীরথ মিশ্রের নয়, কিন্নর রায়ের লেখাতেও বাস্তবতার নানা মাত্রা পরিলক্ষিত।

নলিনী বেরা : ভগীরথ মিশ্রের সমসাময়িক অন্যতম বিখ্যাত লেখক নলিনী বেরা। ঝাড়খণ্ডের অধ্যুষিত এলাকায় জন্ম বলে তাঁর লেখনির মধ্যেও তিনি সেই অঞ্চলের মানুষ ও প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তার ছোটগল্পগুলিতে শহুরে সভ্যতা বাস্তবতার থেকেও আঞ্চলিকতা এবং প্রকৃতির আদিমতা বেশি লক্ষণীয়। তবে ওই সময়কার লেখক হয়েও তাঁর কথাসাহিত্যে বাস্তবতা ছাপ পড়বেনা তা তো হতে পারে না! ভালো করে দেখলে লক্ষ্য করা যায় তার ছোটগল্পগুলিতে কিন্তু সমাজ বাস্তবতা ও অন্তর্দৃষ্টিবতার ছাপ লক্ষণীয়। কল্পনা ও বাস্তবের অদ্ভুত মিশেলে তাঁর কাহিনীর পটগুলি গড়ে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে অন্যতম - বাবার স্মৃতি, হোমগার্ডের জামা, কুসুমতলা শতরঞ্জি খরগোশ, ভাতুয়া মঙ্গল, বসুন্ধরা, বরফ পড়া দিনগুলোয়, সুবলের বাঁশি প্রভৃতি।

বাবার স্মৃতি ছোটগল্পে প্রকৃতই তার বাবার মৃত্যুর ফলে যে শূন্যতা তাকে গ্রাস করেছিল তা নিয়েই লেখা। খুব কম বয়সে তিনি বাবাকে হারান তার ফলে অপূর্ণতা তার ছোটগল্প ও উপন্যাসে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে।

পরিবারের পাশাপাশি সেই সমাজে বাস করার দরুন আঞ্চলিকতা এবং অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপন তার ছোটগল্পগুলিতে খুব বেশি মাত্রায় ধরা পড়েছে। সেখানকার লোভা শবরদের জীবন সাধারণ মানুষের কাছে ছিল অজানা, সেই সব মানুষ ও তাদের জীবন ও চরিত্র নিয়ে তিনি লিখেছেন ভাতুয়া মঙ্গল ছোটগল্পটি। উজ্জল কুমার মজুমদার তার এই গল্পটি পাঠ করে লিখেছেন -

“ভাতুয়া সুন্যার পারিবারিক ইতিহাস, তার খাওয়া-দাওয়া, পরব, তার ভুয়াঙের বোল ‘ভুঙ চুঙ সারেঙা’ এত নিপুণ পর্যবেক্ষণে ফুটে উঠেছে যে লোক সংস্কৃতির প্রতি রক্তের টান ছাড়া এমন চরিত্র বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা অসম্ভব!”^২

আবার ‘শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব’ গল্পটিতে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষে বসবাসকারী এক গরিব কৃষকের চিত্র ফুটে উঠেছে। গরিব হলেও তার আত্মসম্মানবোধ প্রবল। বউ ছাগল চড়াবে এটা সে কখনোই মেনে নিতে পারে না তাই শুধু বউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়। বরং তার মনে হয় বউ বংশের মুখে কালি এসেছে তা শাস্তি দেওয়ার জন্যই সেটা স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছে। এমনকি বউ মারার অপরাধে গ্রামের মাতব্বররা তাকে জরিমানা দিতে বললেও সে এক পয়সাও দিতে চাইনি। এই অপরাধে তাকে এক ঘরে পড়া হয় জল দেওয়া বন্ধ হয় আগুন দেওয়া বন্ধ হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকান্ত এক চুলও মাথা নত করেনি। আসলে এটাই এক গরিব কৃষকের জীবন বাস্তবতা। ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব শ্রীকান্ত নিজের কাঁধে তুলে নিলেও ভাই নলিন পড়াশোনা করে ভালো চাকরি পেলে তাকে দুটো বলদ কিনে দিতে বলে।

“আমাকে এক হাল গরু কিনে দে, দেখবি ওই দিয়ে খেটে ঘরের দরজা জানলা সব আমি করে ফেলব।”^৩

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীকান্তর এই আক্ষেপ ঘোচে না। নলিনী বেরার ছোটগল্পগুলিতে এই সকল মানুষদের জীবনভর ও তাদের নিম্নবিত্ত মানসিকতা বলা ভালো জীবন বাস্তবতার চিত্র বারবার ফুটে উঠেছে।

তাঁর লেখা ‘বোরাঙ্গ’ গল্পটি একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের গল্প। যাকে ঘিরে গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সে হোসেন, পানের কারবার করে। অল্প সংস্থানের জায়গা বলতে ওই বোরাঙ্গটুকু, সেখানে যখন বন্যার জল ঢুকে যায় হোসেন তখন পাগলের মত হয়ে যায়। আবার বৃষ্টি থেমে গেলে সে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ে, খুব স্বাভাবিক এই চিত্র। নিম্নবিত্ত মানুষগুলোর কাছে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা অত সহজ নয়। দুমুঠো খাওয়ার জন্যই তাদের খেটে বেঁচে থাকা, তাই স্ত্রীর প্রতি কাম জাগলেও তাকে সংবরণ করে হোসেন ছুটেছে তার বোরাঙ্গ বাঁচাতে।

স্বল্পপরিসরে একজন লেখক এর দু-একটি ছোটগল্প দিয়ে তার লেখনী সত্তা বিচার করা সম্ভব নয় তবু আমার আলোচ্য বিষয় যেহেতু ভগীরথ মিশ্রের সমকালীন সাহিত্যিক তাই তার মধ্যে নলিনী বেরা অন্যতম।

দেবেশ রায় : ভগীরথ মিশ্রের অগ্রজ ছিলেন দেবেশ রায়। ছোটগল্প রচনায় তিনি এক নতুন রীতির উপস্থাপন করেছিলেন- গল্পের আঙ্গিক নির্মাণ বক্তব্য উপস্থাপন ও বিষয়বস্তু নির্ধারণের এক নতুনত্বের সূচনা করেছিলেন। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তাই সুখ-দুঃখ লড়াই-যুদ্ধ প্রভৃতি সমাজের যাবতীয় কার্যকলাপ মানুষের কাজের উপর প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তাই স্বাধীনতার প্রাক্কালে লেখনি ধারণ করে সেই সময় মানুষের টিকে থাকা লড়াই ও উত্তরণকে দেবেশ রায় সুন্দরভাবে তার ছোটগল্পগুলির মধ্যে তুলে ধরেছিলেন। তিনি সত্তরের দশকের অন্যতম ছোটগল্পকার। বিপন্ন অস্তিত্বের ক্রন্দন প্রবাহ রচনার অক্লান্ত কারিগর তিনি। রূপকের আয়না ব্যবহার করেছেন তার ছোটগল্পগুলিতে এবং রূপকের সঙ্গে অভিজ্ঞতার আনুপাতিক মেলবন্ধন নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে তাঁর গল্পে এসেছে ইতিহাস-ভূগোল-রাজনীতি-সমাজনীতি সঙ্গে মানুষের অনুকূল ও প্রতিকূল সম্পর্ক। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হাড়কাটা, দুপুর, মানুষ, রতন, আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দুপুর গল্পটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের মনস্তত্ত্ব মূলক ছোটগল্প। এই গল্পে প্রথাগত কোন কাহিনী নেই ঠিকই কিন্তু দিনের শেষে একটি বিশেষ প্রহরকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। এক রবিবার ছুটির দিনে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সকল সদস্যের একাকীত্ব আশা আকাঙ্ক্ষা গুরু ও অনুভূতি হতাশা যন্ত্রণা অব্যক্ত কামনা দুপুরের পটভূমি পরিলক্ষিত। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে যেন এই ধরনের গল্প পাওয়া যায় না।

“দেবেশ রায় ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনা সচেতন লেখক। তাই নথিকরন তথা ডকুমেন্টেশন তাঁর গল্পে স্বাভাবিক।”^৪

নাগরিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনযাত্রা কেউ গল্পের কাহিনীতে তুলে ধরেছেন। গ্রামের মানুষের কুসুম তার বিরুদ্ধে মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা তার একটা আলাদা ভীত গড়ে তোলা সবই তার ছোটগল্পে বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গ্রামীণ জীবন বোধ হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ জীবনযাত্রার নানাঘাত প্রতিঘাত সংকটের ছবির সাথে সাথে সেখানে লুকায়িত সংস্কার বিশ্বাস প্রতীক এর অসংখ্য উপাদান তার ছোটগল্পে লক্ষ্য করা যায়।

আফসার আমেদ : সত্তরের দশকের সাহিত্যিকদের মধ্যে আফসার আমেদ অন্যতম। তাঁকে বাদ দিয়ে সত্তরের দশকের সাহিত্য অসম্পূর্ণ। কারণ দেশ স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলার মুসলমান সমাজের চিত্র সম্পূর্ণ তুলে ধরেন প্রথম আফসার আমেদ। স্বাধীনতা ও দেশভাগকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের নির্মম ইতিহাস, লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষের নিরুদ্দেশ যাত্রা, লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তদান এবং জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। তাই তার ছোটগল্পগুলিতে এই ধরনের প্রেক্ষাপটে অধিক উঠে এসেছে। ছোটগল্পের নামের মধ্যে দিয়ে তিনি সেই সময়ের বাস্তবতাকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। তার গল্পে গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন - কান্না, ভয়, আর্তি, খরা ইত্যাদি। তার গল্পের চরিত্রগুলি কোরআন শাসিত, মোল্লা সম্পাদিত গ্রাম ও সমাজ থেকে বেশিরভাগ উঠে এসেছে। হিন্দু চরিত্র নেই তা নয় তবে মুসলমান সমাজের কথা তাদের কষ্ট বেদনা অপমান লাঞ্ছনা কোথাকার গল্পে শৈল্পিক অঙ্গনে তুলে ধরেছেন। আবার সেই সময় মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বা জীবনের চাওয়া পাওয়াও কতটা বিপন্ন হয়েছিল সেই মনস্তাত্ত্বিক সংকটের চিত্র ফুটে উঠেছে তার মিলন, বিরহ, বাসর, বাগদান, অভিমান, এই দাম্পত্যে, ইত্যাদি ছোটগল্পে। মুসলমান সমাজের অন্দরের কথা তাদের জীবনযাপন বা মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি। যেভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে সেই নিম্ন বর্ণীয় মানুষগুলির জীবন সংগ্রামের কথা ফুটে উঠেছে আফসার আমেদের ছোটগল্পে। ভগীরথ মিশ্রের মত তিনিও অনেক গল্পে প্রতিকী মাত্রা ব্যবহার করেছেন। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি দ্বারা পাঠক মনকে এদের বিশ্লেষণ করতে হয়।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় : ভগীরথ মিশ্রের সমসাময়িক যাঁর গল্পে বাস্তববাদের নানামাত্রা অন্যভাবে ধরা দিয়েছে তিনি হলেন দক্ষিণ 24 পরগনার সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের রূপকার কথাশিল্পী ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ওই অঞ্চলে জন্মানোর সুবাদে তাঁর প্রকৃতি পরিবেশ সমাজ সবই আলাদা। সেখানে বসবাস করি মানুষের প্রতি নিয়ত পরিবেশের সঙ্গে লড়াই দারিদ্রতার সাথে লড়াই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে স্থান পেয়েছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় মনে করেন কাহিনী মাত্রই গল্প নয়, বাস্তব কাহিনীকে

অতিক্রম করে গল্পে প্রবেশ করতে হয়। তাই চার পাঁচ দশক আগে লেখা তার গল্পগুলি আজও বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি একেবারেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথাকার, সুন্দরবনের বাধা অঞ্চলের অভিজ্ঞতায় তার গল্পে প্রাণ ঢেলেছে। কথা কার দেবেশ রায় তাই মন্তব্য করেছেন -

“গল্পের জন্য তার কঠিন ও কংক্রিট জায়গাজমি মানুষজন দরকার। এটা ঝাড়েশ্বরের শেখা কোন তত্ত্ব নয়। হর ঈশ্বরের এটাই স্বভাব।”^৫

তার লেখা ছোটগল্পগুলির মধ্যে বিখ্যাত - চিমনি, লাল চুল নীল চোখ, হাওয়া চাষ, নোনা, সিন্দুক, কাচের মেঘ ইত্যাদি।

চিমনি গল্পটিতে যেমন এসেছে কারখানার দূষণ-জনিত সমস্যা। দেশের শিল্প কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী যা বিপদজনক শিল্পের আওতায় পড়ে কিন্তু বাদায় দেশের এই প্রথম কারখানা, অনেক লোক চাকরি পাবে। কিন্তু সেখানে চাষের জমি নষ্ট হবে বা এত রাসায়নিক সার ছড়ালে মাটি আর কদিনই বা ফলন দেবে এই নিয়ে কারো চিন্তা নেই। এমতাবস্থায়তেও গল্পের কাহিনীতে লেখক প্রেমকাহিনী রোপন করেছেন। কারখানার অঞ্চলের টুনার সঙ্গে বসিরহাটের সন্তোষের প্রেম হয়। বিয়ে ও সংসারে স্বপ্ন দেখে তারা কিন্তু এই দূষিত চিমনি দিয়ে এক সময় যে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় তাতেই সন্তোষ দেখে আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সেখান থেকে তাদের পালানোর আর উপায় নেই, মানুষের প্রেমও যেন এই দূষণে দূষিত হয়ে গেছে।

গত তিন দশকে যেভাবে বাংলার সমাজ রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে গেছে সেই বদলগুলিকে গল্পের বিষয় করে তুলেছেন ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভূমি সংস্কার দপ্তরে চাকরি করতেন এবং সেই সূত্রে বর্গা রেকর্ডিং ও পঞ্চগয়েত ব্যবস্থাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেই সব বিষয়কে কেন্দ্র করেও তার ছোটগল্পের কাহিনীগুলি গড়ে উঠেছে। ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় লেখনীতে শুধু সময় নয় যে জায়গার বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে তা অন্য কারোর গল্পে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী : এবার আসাযাক এই সময়ের অন্যতম কথাশিল্পী স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কথায়। তার প্রথম দিকের গল্পগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সমস্যার কথা, সার্থভোগীদের কুচক্র পড়ে ভূমি সংস্কার নীতির ইতি। ইত্যাদি নিয়ে তিনি অনায়াসেই বাস্তবতার মাটি থেকে গল্পের মাটিতে উত্তরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখা তাঁর গল্পগুলি হল - ‘ঢোঁড়া উপাখ্যান’, ‘ভূমির নিত্যতা সূত্র’, ‘স্বস্ত্যয়ন’ ইত্যাদি। গল্পগুলি তখন লেখা যখন বামফ্রন্ট সদ্য ক্ষমতায় এসেছে। তখনও কিছু গ্রামবাংলার ক্ষমতা ছিল মহাজন, জোতদার শ্রেণীর হাতে। কৃষকদের সর্বদা তাদের মুদ্রা লালসার শিকার হতে হত। এখানে অবস্থার বদল আনতেই তৎকালীন সরকার ১৯৭৭ সালে ভূমি সংস্কারে ব্রতী হন। তাই বলা যেতে পারে যে স্বপ্নময় চক্রবর্তী ছোটগল্পগুলিতে তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দিকটি বেশি মাত্রায় ধরা পড়েছে। উপরোক্ত গল্পগুলি সম্পর্কে তিনি নিজে এক জায়গায় জানিয়েছেন -

“এই গল্পগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার পর্বের প্রারম্ভিক দিকটা ধরেছিলাম।”^৬

ভূমি সংস্কারের নেতিবাচক ফল, জমি জমার সমস্যা সেই সময় অনেকের গল্পের পরিসরে এলেও, ব্যাপকতম পরিসরে লক্ষ্য করা যায়নি। এরপর এসেছে বিশ্বায়ন, পুঁজিবাদী সমস্যা, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলেছে সমাজ, মানুষের জীবন, বলা ভালো জীবন বাস্তবতা। তার লেখনীর মধ্যে বেশিরভাগ আমরা সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরতে দেখি। তার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য ছোটগল্পগুলির মধ্যে ভিডিও ভগবান নকুল দানা, ঝাড়ের পাতা, স্বপন বপন, সতর্কতামূলক রূপকথা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বায়নের ফলে লেখা তার কিছু গল্প - তাইতো খুকু রাগ করেছে, মাংস খেকো ঘোড়া ইত্যাদি। এখানে লেখক শ্রমজীবী মানুষদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে যদি শিল্পরীতে দিক দিয়ে বিচার করি তাহলে দেখব ভগীরথ মিশ্রের মতো ইনিও বাস্তববাদী বা বাস্তবমুখী। বাস্তববাদকে তার ছোটগল্পে নানা মাত্রা ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

অমর মিত্র : সমকালীন আরেক কথাকার অমর মিত্র। তাঁর লেখা অধিকাংশ গল্পই গ্রাম কেন্দ্রিক, তবে শেষের দিকে কিছু গল্পে গ্রামের পাশাপাশি শহরের মানুষের সমস্যাও প্রাধান্য পেয়েছে। একই সাথে যে বিষয়টি তার গল্পে পাঠককে ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে তা হল গ্রাম বা শহরে খেলাধুলাভিত্তিক অনেক গল্প। ১৯৯০ এর বিশ্বকাপ ফুটবলের আবহে তিনি লিখেছেন-সাত নম্বর, মারাদোনা ইত্যাদি। এছাড়া ‘গাছ-পাখি-পাথর’, ‘গাঁওবুড়োট’ তৎকালীন গ্রাম নিয়ে লেখা।

‘গাঁওবুড়োট’ গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই কুসুমপুরের বুড়ো ফকির চাঁদ যায় তার বড় বাবুর কাছে দুঃখের দাওয়াই আনতে। যেতে যেতে পথে দেখা হয় কালো মানুষ ছোট সোনা নাস্তিক, সাঁওতাল থামের মানুষজন, এমনকি গাছ তলায় বসে থাকা কুষ্ঠ রোগীদের সাথেও। বুড়ো সকলের কষ্ট দেখে তাদের রোগের ওষুধ সে বড়বাবুর কাছ থেকে এনে দেওয়ার দাবি জানাই কিন্তু সে নিজেই ফকির চান বাবুর বাড়ি খুঁজে পায় না। সে এক স্বপ্নে বিভোর থাকে যে এরকম এক মানুষ সে পাবেই যে তার দুঃখ দুর্দশা ঘোচাবে। ঘছাবে অন্যদের রোগ জ্বালাও। অমু মিত্রের হাতে লেখা এই গল্পে যেন এক অদ্ভুত জাদু বাস্তবতা স্থান পেয়েছে। অবশেষে সাধারণ মানুষ যখন বুড়োর কথা শুনে হেসেছে এবং তাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনতে চেয়েছে তখন পুরো বালিয়াড়িতে আছড়ে পড়েছে। এবং আছড়ে পড়তে পড়তে জীবনের শেষ মুহূর্তের অপেক্ষা করে চলেছে।

আবার ‘গাছ-পাখি-পাথর’ গল্পের মধ্যে আমরা দেখি সেখানে মহিষরাথান বুনোপাড়া নামক একটি পাড়া ঢুকে যায় সল্টলেব মিউনিসিপ্যালিটিতে। ফলে তার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। সেই বুনোপাড়ায় অবস্থিত মানুষগুলো মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় ঢুকে যেন নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কর্মচা গাছ, পেয়ারা গাছ, বসেক যষ্টি মাসের বাতাস আজ তাদের কাছে নিরুদ্দেশ। তারা যেন বুনো পাড়ার স্বপ্নে বিভোর থাকতে চাই। তারা ভাবতে পারেনা নতুন বুনোপাড়, ‘গাছ-পাখি-পাথর’র গন্ধ ছাড়া।

আবার ‘সাত নম্বর’ গল্পটিতে তিনি লিখেছেন ফুটবলের আন্তর্জাতিক প্রশাসনের নিয়মে কথা। এভাবেই গল্পের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখানে লেখকের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কথা ধরা পড়েছে। আর বিস্তারিত না বললেও বলা যায় গল্পকার অমর মিত্রের ছোটগল্পের জগত এখানেই অন্যদের থেকে বিচিত্র ও সূক্ষ্ম পার্থক্যে আলাদা।

ভগীরথ মিশ্রের সমকালে আরো অনেক লেখকরা রয়েছেন যাঁদের নিয়ে এখানে আলোচনা করা সম্ভব হল না। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিকরা হলেন - হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮), শিবতোষ ঘোষ (১৯৪৯), জয়া মিত্র হাজার (১৯৫০), মানব চক্রবর্তী (১৯৫১), সৌমিত্র লাহিড়ী (১৯৫২), শ্রীকুমার চক্রবর্তী (১৯৫৪), সৈকত রক্ষিত (১৯৫৪), প্রমুখ। তবে যাঁদের লেখা নিয়ে এবং লেখনী নিয়ে আলোচনা করা হল তাদের লেখায় যে বিষয়টির মিল পাওয়া যায় তা হল বাস্তববাদ। আমার গবেষণা কর্মের বিষয়বস্তুও তা-ই। সমকালীন হয়ে তাঁদের লেখায় যে বাস্তবতা ধরা পড়বে এটাই স্বাভাবিক কারণ গল্পে কাল হোক বা মিথ, রোমান্টিকতা হোক বা অস্তিত্বের ক্রন্দন প্রবাহ, সবচেয়েই এসেছে বাস্তবতা, যা সত্তরের দশকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ৭০ পূর্ব সাহিত্য বা রবীন্দ্রসাহিত্য যে অবাস্তব তা কিন্তু নয়, তবে সেখানে বাস্তবতার যে ধারাটি দেখানো হয়েছে তা সত্তরের দশক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ৭০ দশকে এসে বাংলা ছোটগল্পের বাস্তবতা চিত্রণের ধারাটি পাল্টে গেছে। ত্রিশের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বাস্তবতা চিত্রণের প্রচলিত ধারা সামান্য হলেও বাঁক নিয়েছিল। ছোটগল্পে বাস্তবতার চিত্র এই প্রথম গতানুগতিকতা থেকে সরে এসেছে। ঘুরে আসার ক্ষীণ পথ ৭০ এর দশকে এসে স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে। এসেছে অন্তর্দৃষ্টিবাদের ধারা, এসেছে জাদু বাস্তবতা। এক্ষেত্রে বাস্তববাদের অধিক পরত নির্মাণ করে বাস্তবতাকে প্রতিকীরূপ দেবার প্রয়াসী হয়েছেন লেখক ভগীরথ মিশ্র। বলা যেতে পারে তিনি এই ধারার সার্থক শিল্পী। তাঁর গল্প ভাবনার নানা মাত্রা, নানা মুখ, ঐ সময়ে রচিত ছোটগল্প ভাবনাটিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে। চোখে দেখা ঘটনাকে হুবহু ব্যবহার না করে অন্য দ্যোতনায় তিনি উত্তরণ করেছেন। তবে ‘লেখকের কথা’য় কথাকার ভগীরথ মিশ্র নিজে এক জায়গায় জানিয়েছেন -

“...একজন গল্পকারের সমস্ত গল্পে তো কখনোই ষোলআনা উতরায় না।”^৭

অর্থাৎ গল্পকারের প্রথম দিকের গল্পের সাথে সময় যত এগিয়ে চলে গল্পের বিষয়বস্তু ততই পরিবর্তন হতে থাকে। তার মূল কারণ সময়কাল এবং সময়ের সাথে সাথে সমাজের পরিবর্তন, মানুষের পরিবর্তন একই সাথে মানব মনের পরিবর্তন।

এখানে বাস্তববাদ বহুমুখী হয়ে ধরা দেয়। নাগরিক পাঠের একাংশ সেই দ্যোতনাকে সঠিক ধরতে পারে না। অনেকের কাছে অন্তর্বাস্তবতা ও জাদু বাস্তবতা অনেকাংশে এক হয়ে গেছে। কিন্তু বিষয়গুলি যে কোথায় আলাদা তা ভগীরথ বাবু খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন। বিষয় দুটির সাথে সত্তরের দশকের আগে আমরা একেবারেই পরিচিত ছিলাম না, তার নয়। তবে জাদু বাস্তবতা এর আগে সেভাবে ধরা পড়েনি বললেই হয়। তার ফলে একটি গল্প বলার গঠন বিশিষ্ট রূপে ধরা দিয়েছে। ভগীরথ মিশ্রের কয়েকটি গল্পের কাহিনীতে বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করে বিষয়টিকে অন্যান্য কথা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের পার্থক্য কোথায় তা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে ভালো হত। কিন্তু এখানে আমি শুধুমাত্র ৭০ এর দশকের কয়েকজন কথা সাহিত্যিকদের গল্পে কি ধরনের বাস্তবতা এসেছে বা বাস্তবতার রূপগুলো সত্তরের দশকে কতটা প্রস্ফুটিত তাই দেখাতে চেয়েছি।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সাধন, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৬ মার্চ, ২০২০
২. মজুমদার, উজ্জল কুমার, ২০০৫, গল্প পাঠকের ডায়েরি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৩৫
৩. বেরা, নলিনী, 'শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব', শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০০৩, পৃ. ৫২
৪. 'দেবেশ রায়ের ছোট গল্প : ভিন্ন ধারার নির্মাণ', শমীক রায়, বাংলা ছোট গল্প পর্যালোচনা-বিশ শতক, সম্পা. শ্রাবণী পাল, অক্ষর প্রকাশনী ২০১৬, পৃ. ৫৯৫
৫. রায়, দেবেশ, আগস্ট ২০১৯, ভূমিকা, ঝাড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২
৬. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, ২০১১, ভূমিকা, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৭. মিশ্র, ভগীরথ, জানুয়ারি ২০২৩, লেখকের কথা, গল্পসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৭